দাম ২ টাকা

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৫, সংখ্যা: ৯ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | ডিসেম্বর ২০১৪

জানা অজানা

বুদ্ধিমান টিয়া

গফিন কক্যাটু হল এক ধরনের টিয়া। তারা বুদ্ধিমান পাখি, আর তার প্রমান হল ওরা ছোটখাটো সরঞ্জাম যে শুধু তৈরি করতে পারে তাই নয়, তা তৈরি অন্যদের শেখাতেও পারে।

এমনই এক গফিন কাকাতুয়ার নাম ফিগারো। সে কাঠের টুকরো ঠোঁট দিয়ে চেঁছে লম্বা কাঠি তৈরি করতে পারে। কিন্তু কাঠি তার কী কাজে লাগে? বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে তার খেলনা বা খাবারের বাটি নাগালের বাইরে চলে গেলে, ফিগারো ওই কাঠির সাহায্যে সেগুলি নিজের কাছে টেনে আনে। শুধু তাই নয়। নাগালের বাইরে থাকা তার প্রিয় বস্তুগুলির দূরত্ব অনুযায়ী সে তার তৈরি কাঠির মাপ ঠিক করে।

ভিয়েনা আর অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি সহ ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের গবেষকরা জানিয়েছেন যে আরও আশ্চর্যের কথা, গবেষণা কেন্দ্রের অন্যান্য গফিনরাও ফিগারোর দেখাদেখি কাঠি তৈরি করতে আর তা ব্যবহার করতে শিখেছে।

একটি কুকুরের অবিশ্বাস্য কাহিনী

এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে দুর্গম পথ হেঁটে, সাঁতরে পেরল ইকুয়েডারের আর্থার

শুধু তার মৌখিক সাক্ষাৎকারটাই যা বাকি। তা ছাড়া দেশি বিদেশি টেলিভিশনের পর্দা, পত্র পত্রিকা সর্বত্রই 'আর্থার'র ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। সুইডেনে বোধহয় এই প্রথম একটি কুকুর 'সেলিব্রিটি' হয়ে উঠল। আর্থার - নামটিও তার সদ্য পাওয়া। কে জানে এতদিন লালু-ভুলু বা টম-টেডি এই সব নামে তাকে কেউ ডাকত কি না। তবে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে আর্থারের আগে এমন রেকর্ড কেউ করেনি। গিনেস বুকেও এই ব্যাপারে কারও নাম নেই বোধহয়। কিন্তু সে করলটা কি যাতে বিশ্ব জুড়ে তাকে নিয়ে এত হই চই? ইকুয়েডারে ৪৩০ কিমি একটি অ্যাডভেঞ্চার রেসিং প্রতিযোগিতায় এক সুইডিশ খেলোয়াড় দলে মাঝপথ থেকে নাছোড়বান্দা আর্থার ভিড়ে গিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে বসে আছে।

ঠিক কি ঘটেছিল জানতে অবশ্যই আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই দিনটিতে, যেদিন অ্যাডভেঞ্চার রেসিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ' এ যোগ দিতে

আর্থার ও মিকায়েল লিন্দনর্দ দীর্ঘ পথের দুই সঙ্গী (সৌজন্য: ভাইরালস্পেল.কম)

আসা 'সুইডিশ টিম পিক পারফরমন্স'র ক্যাপটেন মিকায়েল লিন্দনর্দ সঙ্গীদের নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সারছিলেন রেইনফরেস্ট দিয়ে যাবার পথে। হঠাৎই দেখেন একটু খাবারের আশায় অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটি নেড়ি কুকুর। মিকায়েল করুণাবশত এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দেন তার দিকে। ব্যস, সেই থেকে কুকুরটি তাদের সঙ্গে। অ্যামাজনের বর্ষারণ্যের মধ্য দিয়ে তাদের অ্যাডভেঞ্চার রেসের সঙ্গী হয়ে ছুটতে লাগল। বছর সাতেকের এই কুকুরটির নামকরণ হল - আর্থার।

দলনেতা মিকায়েল সহ চারজনের দলটির সঙ্গে তার এমনই এক অদৃশ্য বন্ধন তৈরি হল যে, ওই যাত্রায় আর্থার এক মুহূর্তের জন্যও আর তাদের কাছ ছাড়া হল না। যখন তাঁদের উঁচু পাহাড় টেনে হিঁচড়ে ডিঙোতে হচ্ছে, পিঠে একটি ক্ষত নিয়ে আর্থারও তাদের সঙ্গে হাঁচরপাচড় করে উঠল। যখন পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে নামতে হচ্ছে, এক হাঁটু কাদা ভেঙে হাঁটতে হচ্ছে আর্থার সঙ্গে। বাইকের পেছনে বসেও আর্থার সঙ্গে চলল। তাঁদের সঙ্গ ছাড়বে না বলে এমনকী দুর্গম জল পথেও সে চলল। যে পথ চামড়ার ছোট্ট ডিঙিতে করে পার হওয়ার সময় আর্থারকে সঙ্গে নিলে যে তার

এর পর ২ পাতায়

ধূমকেতুর বুকে ঘুমিয়ে 'ফিলে'

দশ বছর ধরে এক ধূমকেতুর পেছনে ছুটছিল একটি মহাকাশযান। আমাদের সৌরমন্ডলে ৬৪০ কোটি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে, গত ১২ নভেম্বর ওই যান সেই ধূমকেতুর ওপর অবতরণ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে অমন বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ এই প্রথম। মহাকাশযানটির নাম 'রোসেটা'। পাঠিয়েছে ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। উদ্দেশ্য, ধূমকেতুর আকাশ, বাতাস, মাটির তথ্য পৃথিবীতে পাঠানো।

আর সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর জন্ম রহস্যের কিছু কথা জানা। ধূমকেতুটির নাম ৬৭পি/চুরিওমভ জিরাসিমেঙ্কো। নভেম্বর ১২ তারিখে, ভারতীয় সময় রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ সেটিকে প্রদক্ষিণরত রোসেটা থেকে এক ল্যান্ডার বা ছোট যান, যার নাম 'ফিলে' **(ছবি)**, অবতরণ করে ধূমকেতুটির বুকে।

সে রাতে তাঁদের অভিযান সফল হওয়ায় আনন্দে ফেটে পড়েছিলেন ইউরোপের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা, যাঁরা দশ বছর ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন ওই দিনটির জন্য। গবেষণা কেন্দ্রর প্রধান বলেন, "আমরা এবার পৃথিবীর জন্মের কথা জানতে পারব; বুঝতে পারব ভবিষ্যতে আমাদের কী করা উচিৎ।"

কিন্তু সে সুযোগ হয়ত হাতছাড়া হয়ে গেছে। ফিলে তার নির্ধারিত জায়গা থেকে আধ কিলোমিটার দূরে নামে আর এক উঁচু টিলার আড়ালে পড়ে যায়। সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয় না। অথচ তার যন্ত্রপাতি চলে সৌরশক্তির সাহায্যে। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই সেটি শক্তিহীন হয়ে পড়ে ।

তবে যে কয়েক ঘন্টা তার জীবনী শক্তি পুরমাত্রায় বহাল ছিল তারই মধ্যে ফিলে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠিয়েছে পৃথিবীতে। সে জানিয়েছে যে সে ধূমকেতুর বাতাবরণে জৈবিক মলিকিউলের সন্ধান পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ওই ধরনের মলিকিউল প্রাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক মৌলিক উপাদান। আরও এক গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠিয়েছে ফিলে। সে জানিয়েছে ধূমকেতুতে আছে বরফ – জলের বরফ।তাহলে কি ধূমকেতুর মাধ্যমে গ্রহ গ্রহান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে প্রাণের উপাদান, প্রশ্ন উঠছে বিজ্ঞানী মহলে।

সূত্রঃ ওয়ার্ল্ড সায়েন্স

সিন্ধুঘোটকের মৃত্যু

গত কয়েক বছরে পেরুর সমুদ্রোপকূলে শ'য়ে শ'য়ে সি-লায়ন, ডলফিন ইত্যাদি নানা জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটেছে। সম্প্রতি ৫০০ সি লায়ন বা সিন্ধুঘোটককে মৃত অবস্থায় দেখা গেছে উত্তর পেরুর সমুদ্র তীরে। কেউ বলছেন জেলেরা কোনও বিষ দিয়েই মেরেছে ওই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের। তবে পেরুর পরিবেশ পুলিশরা মনে করছেন হয় তারা কোনও রোগে মরেছে, নয় তো মরেছে প্লাস্টিক পেটে গিয়ে। সঠিক কারণ বোঝা যাচ্ছে না। এখনও অবশ্য তদন্ত চলছে।

বিবিসি'র একটি প্রতিবেদন বলছে যে, ওই মৃতদের মধ্যে নানা বয়সের প্রাণী আছে। এই একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে আরও উত্তর উপকূলে নভেম্বর মাসেরই প্রথম দিকে। সেই মৃত তালিকায় ছিল প্রায় ২০০ সি লায়ন, ডলফিন, কচ্ছপ ও পেলিকান। এবং ২০১২ সালেও এই অঞ্চলে কয়েক'শ ডলফিনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই মৃত্যুরও কোনও সঠিক কারণ জানা যায় নি। তবে সেখানকার এক পরিবেশ সংস্থা সমুদ্রে তেল অনুসন্ধানকারীদের ঘটানো বিস্ফোরণে যে বিপুল শব্দ ও তরঙ্গের অভিঘাত হয়, তাকেই ওই প্রাণীদের মৃত্যুর জন্য দায়ী করছে। সরকার বলছে প্রাকৃতিক কারণেই ওই মৃত্যু ঘটছে।

সুদূর লাহুলেও দার্জিলিঙের রেশ

এখন ডিসেম্বর। এত দিনে বরফে ঢাকা পড়ে গেছে রাস্তাগুলো। সব বাড়ির ছাদেও জমেছে বরফের পুরু আস্তরণ। অনেক বাড়িতে তালা ঝুলছে। শহর আর গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে বহু বাসিন্দা। প্রায় চার পাঁচ মাস বরফের মোটা চাদরে মোড়া থাকবে গোটা জেলা। অক্টোবর শেষ হতে না হতেই, পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে, হিমাঙ্কের অনেক নীচে দিন কাটাবেন স্থানীয় মানুষজন। আকাশ পথে, হেলিকপ্টারের সাহায্যে, সপ্তাহে এক দিন আসবে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

ভারতের হিমাচল প্রদেশের ১২ হাজার ফিট ও তারও বেশি উচ্চতায় ছড়িয়ে থাকা লাহুল-স্পিতি জেলায় এটাই প্রতি বছরের নিয়ম। কিন্তু ওই সুদূর, দুর্গম, তিব্বত-ছুঁয়ে-থাকা ভারতের সীমান্ত জেলার সদর দপ্তর কেলঙ-এও পশ্চিমবাংলা তার চিহ্ন রেখেছে।

ছোট্ট শহর কেলঙ। জনসংখ্যা খুব কম। বেশিরভাগই বাইরে থেকে আসা সরকারি কর্মচারী। সরু সরু চড়াই-উৎরাই রাস্তা। তার দুপাশে পাথরের চৌকো-চৌকো সব ঘরবাড়ি। জমকালো দোকানপাট নেই, তবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী মোটামুটি পাওয়া যায়। একটি এ.টি.এম-ও আছে। শীতের মরশুমে অবশ্য সেটি বরফে ঢাকা থাকে। আর এ সবের মধ্যে, শহরের এক কোণে, আছে 'দার্জিলিঙ ধাবা'। চাইলেই দোকানের মালিক-কাম-কুক-কাম-কর্মচারী কাঠের টেবিলে সাজিয়ে দেন সুস্বাদু চাওমিন, থুপ্পা অথবা মোমো।

চলার পথে দেখা

হঠাৎ কেলঙ-এ দার্জিলিঙ কেন? নামটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন স্রিং **(ছবি ওপরে)**। ভুটিয়া মহিলা। স্রিং-এর জন্ম, বড় হওয়া পশ্চিম বাংলার সেই পাহাড়ের 'রাণী'র কাছে যার মুকুটে ঝলমল করে কাঞ্চনজংঘা। কিন্তু জীবিকার সন্ধানে একদিন চেনা পাহাড় ছেড়ে পা বাড়াতে হয় অচেনা পাহাড়ের উদ্দেশে। চলে আসেন সুদূর হিমাচল প্রদেশে। কেলঙ-এ। আর ফেলে আসা তাঁর সেই ছোটবেলার শহরের নামেই খোলেন 'দার্জিলিং ধাবা'। এক দেশ থেকে আরও এক দেশ, এক জায়গা থেকে অন্য কোনও জায়গা, নিরাপত্তা বা জীবিকার সন্ধানে মানুষের যেন চলার কোনও বিরাম নেই।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসেব অনুযায়ী ২০১৩ সালে ২৩ কোটিরও বেশি মানুষ নিজের দেশের বাইরে দিন কাটিয়েছেন। বিভিন্নজন বিভিন্ন কারণে দেশছাড়া হয়েছেন। কেউ গেছেন কাজের সুবাদে, কেউ উন্নত জীবনের খোঁজে, কেউ নিজের দেশে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছেন অন্য দেশে। উন্নয়নের ধাক্কায় ভিটে-মাটি খুইয়েও গেছেন অনেকে, আর কেউবা প্রকৃতির রোষে নিঃস্ব হয়ে চলে গেছেন অন্যত্র।

অনীশ গুপ্ত

আর্থার গড়ল বিশ্ব রেকর্ড, পেল এক নতুন জীবন

১ পাতা থেকে

এবং মিকায়েলদের বিপদ ঘটতে পারে - আয়োজকদের এই সতর্ক নিষেধ ছিল। তা মেনে মিকায়েলরা তাকে পাড়ে রেখে ডিঙি বেয়ে রওনাও হলেন। কিন্তু আর্থার তখন জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতরে চলল তাঁদের ডিঙির পাশাপাশি। কোনও অবস্থাতেই যে আর্থার তাঁদের সঙ্গ আর ছাড়বে না বুঝে দলনেতা তাকে জল থেকে ডিঙিতে তুলে নিলেন। এবং টিম পিক পারফরমেন্স'র সদস্যদের ওই অ্যাডভেঞ্চার রেসের শেষ পর্যন্ত আর্থার সঙ্গী থাকল।

কিন্তু এখানেই আর্থার'র গল্প শেষ নয়। সে ওই রোমাঞ্চকর দীর্ঘ দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড তো গড়লই, উপরন্তু সে পেয়ে গেল লিন্দনর্দ'র ভালবাসার আশ্রয়ে এক নতুন জীবন।

নিজের দেশে আর্থারকে নিয়ে গেছেন

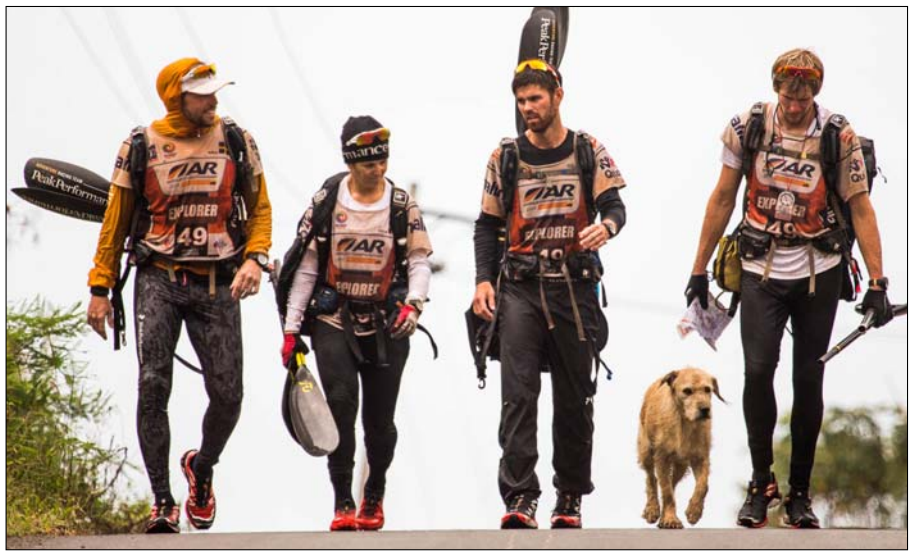

অভিযাত্রীদের সঙ্গে আর্থার (সৌজন্য: পিক পারফরমেন্স; প্রাই.অর্জ)

মিকায়েল। স্টকহোমে আর্লান্ডা এয়ারপোর্টেই আর্থারের পরিচয় হয়েছে তাঁর স্ত্রী ও শিশু কন্যার সঙ্গে। ডাক্তার দেখিয়ে তার পিঠের ক্ষত সারানো হয়েছে। এখন অবশ্য তাকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে। মার্চ'র পর সে মিকায়েল লিন্দনর্দ'র বাড়িতে গিয়ে উঠবে। তবে এখন নিয়মিত তাকে দেখতে যাচ্ছেন টিমের সব সদস্যরা। এবং মিকায়েলের পরিবারই শুধু নয়, তাঁর আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধব সবাই দিন গুনছেন কবে আর্থার বাড়ী আসবে।

লিন্দনর্দ বলেছেন,'ইকুয়েডরে আমি এসেছিলাম ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ জিততে তার পরিবর্তে আমি পেলাম এক নতুন বন্ধুকে।' তাঁর বন্ধু আর্থার এখন হিরো। বিবিসি, ওয়াশিংটন পোস্ট, দ্য ডেইলি মেল সর্বত্রই আর্থারের কাহিনি। রীতিমত 'আর্থার ফ্যানক্লাব' তৈরি হয়ে গেছে। এমনকী ওই টিম সদস্যরা 'আর্থার ফাউন্ডেশন' গড়ছেন ইকুয়েডরের কয়েক লক্ষ আশ্রয়হীন কুকুরদের সাহায্যের জন্য।

মালবী গুপ্ত
সূত্রঃ দ্য টেলিগ্রাফ, দ্য লোকাল

গেকো

অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া সব জায়গাতেই তাদের দেখা যায়। রঙিন এই লিজার্ডদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ। বর্ষারণ্য, মরুভূমি কিম্বা তুষার পাহাড় - সবর্ত্রই তারা থাকতে পারে। গেকোদের জীবনে লেজের বিরাট ভূমিকা। লেজ তাদের শরীরের ব্যালেন্স ঠিক রাখে, জ্বালানি হিসেবে চর্বি জমিয়ে রাখে এবং রঙ বদলে শত্রুর চোখে ধোঁকা দিয়ে পালাতে সাহায্য করে। প্রাণ বাঁচাতে পালাতে পারে তারা লেজ খসিয়েই। নানা প্রজাতির গেকো হয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ আজ বিপন্নও বটে।

ম্যামথ বিলুপ্ত আগেই, এবার কি হাতির পালা?

তাদের বলা হত 'ম্যামথ'। ইংরেজি শব্দ 'ম্যামথ'-এর মানে প্রকান্ড। অর্থাৎ আকারে তারা ছিল বিরাট। তারা ছিল হাতিদের পূর্বপূরুষ। নাম ম্যামথ হলেও আকারে তারা আজকের আফ্রিকার হাতির মতই ছিল।

ম্যামথ যখন ছিল, তখন ঘোর তুষারযুগ চলছে পৃথিবীতে। প্রবল ঠান্ডা। স্থলভাগের অনেকটাই বরফে ঢাকা। ফলে তাদের চেহারাও ছিল সে রকম। শরীর থেকে যাতে উত্তাপ হ্রাস না পায়, তাই তাদের কান দুটো আর লেজ ছিল খুব ছোট, আর গায়ে ছিল পশমের মত লোম। লক্ষ করার বিষয় হল তাদের উত্তরসূরিরা আজ যেখানে থাকে – যেমন আফ্রিকা আর এশিয়া – সেগুলি গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল। তাই এখনকার হাতিদের গায়ে লোমের কম্বল নেই। ল্যাজ ছোট হলেও, কান দুটি বিরাট, যা তারা পাখার মত নাড়ে নিজেদের ঠান্ডা রাখতে।

মনে করা হয় আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বেশিরভাগ অঞ্চল থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায় ম্যামথ। তবে উত্তর মেরুর র‍্যাঙ্গেল দ্বীপে নাকি ৫০০ ম্যামথ ছিল ৪,০০০ বছর আগে পর্যন্ত। পৃথিবী জুড়ে মানুষের পাশাপাশি তারা বাস করেছে তাদের অবলুপ্তির সময় পর্যন্ত। প্রাচীন মানুষের আঁকা তাদের বিস্তর ছবি ছড়িয়ে আছে রাশিয়া, ফ্রান্স আর স্পেন-এ পাওয়া গুহাচিত্রে। বেশিরভাগই

শিকারের ছবি – বর্শা উঁচিয়ে মানুষের ম্যামথ শিকারের দৃশ্য। আসলে, সেই প্রবল শীতের যুগে ম্যামথের মাংস মানুষকে অনেকটা শক্তি যোগাত।

কেন বিলুপ্ত হয়ে গেল ওই বিশাল প্রাণীটি? বিজ্ঞানীরা তার জন্য দুটি কারণের কথা বলেছেন। এক, আবহাওয়া পরিবর্তন; দুই, অবাধ শিকার। তুষার যুগ স্থায়ী হয়েছিল অনেক কাল। বলা হয় ২০/২১ হাজার বছর আগে তা তীব্রতম রূপ ধারণ করে। তারপর হঠাৎই প্রকৃতিতে দেখা দেয় পরিবর্তনের লক্ষণ। কয়েক হাজার বছর ধরে টানা চলতে থাকা শৈত্য প্রবাহকে একটু একটু করে পেছনে ঠেলে আকাশে বাতাসে লাগে উষ্ণতার ছোঁয়া। দিকে দিকে গলতে থাকে বরফের মোটা আস্তরণ। প্রায় ১০ হাজার বছর ধরে একটু একটু করে তুষার যুগের রেশ মিলিয়ে যেতে থাকে পৃথিবী থেকে। গাছ-পালা, জল-হাওয়া সবই বদলে যায়। নতুন পরিবেষের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে বিপন্ন হয়ে পড়ে ম্যামথের দল, আর সেই সঙ্গে চলতে থাকে শিকার। ফলে এক দিন বিলুপ্ত হয়ে যায় হাতিদের ওই লোমোশ পূর্বপূরুষ।

ম্যামথের পর এবার কি হাদিদের পালা? তারাও কি যাবে বিলুপ্তির পথে? তুশার যুগের শেষে পরিবেষ যেমন আমূল বদলে গিয়েছিল, এখন উষ্ণায়নের কালেও প্রকৃতিতে ঘটবে নানা ওলটপালট। ধেখা দেবে খরা, তাপপ্রবাহ, অতিবৃষ্টি আর সেই সঙ্গে চলবে বন ধ্বংস আর বিরামহীন, লাগামছাড়া শিকার। তাই প্রশ্ন: হাতিরা থাকবে তো?

পিডি

গৃহহীন মানুষ ছড়িয়ে আছে গরীব, ধনী সব দেশে

জেনে রাখা ভাল

পৃথিবীতে এই মুহূর্তে কত মানুষ গৃহহীন তার সঠিক পরিসংখ্যান অসম্ভব। কারণ প্রতিদিন কোনও না কোনও দেশে কোথাও না কোথাও মানুষ গৃহের আশ্রয় চ্যুত হচ্ছে। আর্থ সামাজিক, ব্যক্তিগত, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ গৃহহারা। দেখা যাচ্ছে -

- রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন'র ২০০৫ এর হিসেব বলছে সারা পৃথিবীতে ১০ কোটি মানুষ আশ্রয়হীন, যাদের মাথার ওপর কোনও ছাদ নেই।
- ১০ কোটি গৃহহীন মানুষের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু।
- ভারতে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন ২০০৩ এর

হিসেব অনুযায়ী।

- ইউরোপে ৩০ লক্ষ মানুষের মাথার ওপর কোনও ছাদ নেই। তার মধ্যে আবার ইংলন্ডে সব থেকে বেশি প্রতি ১০০০ এ' ৪ জন সেখানে আশ্রয়হীন।
- আমেরিকায় নিরাশ্রয় মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ ৫০ হাজারের মত। যার মধ্যে ১০ লক্ষ ৩৭ হাজারই হচ্ছে শিশু।
- রাশিয়ায় প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ নিরাশ্রয়, যার মধ্যে শিশুর সংখ্যাই ১০ লক্ষ।
- নাইজেরিয়ায় মনে করা হচ্ছে গহহীন মানুষের সংখ্যা হবে ২ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি।
- অস্ট্রেলিয়ায় যে ১ লক্ষ ৫০০০ মানুষের ঘর নেই তাদের মধ্যে ৪৪ শতাংশই মহিলা, আর শিশু হল ১২ শতাংশ।

সূত্রঃ হোমলেসওয়ার্ল্ডকাপ.অরজ

কোরাল-অক্টোপাস-ডলফিনদের রাজত্ব

ভারতের ‘প্রথম মেরিন ন্যাশনাল পার্ক’টিতে একবার পৌঁছতে পারলেই হল, রূপে গুণে অনন্য সেই উদ্যানে সামুদ্রিক জীবনের নানা রহস্য একে এক উন্মোচনের সুযোগ ঘটবে। কারণ গুজরাটের জামনগর জেলায় সমুদ্রোপকূলে এই জাতীয় উদ্যানের মধ্যেই রয়েছে ৪২ দ্বীপ। সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান, যেখানে রয়েছে ছোট ছোট ৫৪ দ্বীপ, তার সঙ্গে বেশ মিলও আছে দেখা যাচ্ছে। জামনগরে ‘গাল্ফ অফ কচ্ছ’এ এই উদ্যানটির জন্ম ১৯৮২ সালে। বত্রিশ বছর বয়েসি ভারতের পশ্চিম উপকূলে এই জাতীয় উদ্যানই দেশের প্রথম মেরিন ন্যাশনাল পার্ক’র মর্যাদা পেয়েছে।

যে ১৬২.৮৯ বর্গ কিমি জুড়ে বিস্তৃত জাতীয় উদ্যানটি, তার বেশিরভাগ দ্বীপকেই ঘিরে রয়েছে কোরাল রিফ বা প্রবাল প্রাচীর। এই দ্বীপগুলির মধ্যে সব থেকে পরিচিত হল পিরোটান। এই অঞ্চলে বাদাবনই আছে ৬ রকমের, আর কত আকার আকৃতিরই না কোরাল এখানে। যাদের দেখতে নাহ, জলের তলায় নামতে হয় না, ওপর থেকেই তাদের অসাধারণ রঙিন চেহারা চোখে পড়ে। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির বাদাবন ও কোরাল রিফগুলি নানা জলজপ্রাণী ও মাছেদের আবাসস্থল। তার সুবাদে এই অঞ্চল স্পুনবিল, হেরন, পেইন্টেড স্টর্ক, ইগ্রেট, ফ্লেমিঙ্গো আর অনেক ধরনের হাঁসজাতীয় পাখিদের রীতিমত আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে।

গুজরাটের জামনগর জেলায় সমুদ্রোপকূলে জাতীয় উদ্যানের মধ্যেই রয়েছে ৪২ দ্বীপ

অবাক লাগে এখানে প্রায় ৯৪ প্রজাতির শুধু জলের পাখিই দেখা যায়। আছে অন্যান্য পাখি, ৩৭ প্রজাতির কোরাল ও ৭০ প্রজাতির সামুদ্রিক স্পঞ্জ। নানা ধরনের সামুদ্রিক ঘাস দেখা যায়, যে ঘাসের ওপর অলিভ রিডলে সহ ৩ প্রজাতির বিপন্ন ও পরিযায়ী সমুদ্র কচ্ছপরা নির্ভর করে। আছে নানা রকমের জলজ উদ্ভিদ, শ্যাওলা ইত্যাদি। আর মাছ-কাঁকড়া-চিংড়িদের তো অফুরন্ত ভান্ডার যেন এই উদ্যান। এখানে ১৫০-২০০ প্রজাতির মাছ, ৩০ রকম কাঁকড়া, আর প্রায় ২৭ রকমের চিংড়ি এবং অন্তত ২০০ প্রজাতির শামুক থাকে। আর জেলিফিশ, অক্টোপাসদের তো ঘর বাড়ি এই জাতীয় উদ্যান। দেখা মেলে সাধারণ ডলফিন ছাড়াও বটলনোজ ডলফিন, হাম্পব্যাক ডলফিন, দুগঙ, সি-হর্স ইত্যাদির মত প্রাণীদেরও।

জাতীয় উদ্যান * মেরিন ন্যাশনাল পার্ক

সুন্দরবন জাতীয় উদ্যানের মতই এখানকার বাদাবনেও জোওয়ার ভাঁটা খেলে। নদী, খাঁড়ি দিয়ে ঘোরা যায় এই মেরিন ন্যাশনাল পার্কের দ্বীপগুলিতে। দু’ঘন্টার জলযাত্রায় যদি একবার পৌঁছনো যায় সেখানকার বিখ্যাত পিরোটান দ্বীপে তাহলে সেখানে অসংখ্য সমুদ্রপাখি ও জলক্রীড়ায় মত্ত ডলফিনদের সঙ্গে তো পর্যটকদের দেখা হবেই হবে। আর এক দ্বীপ নারারা, পিরোটানের মতই সুন্দর। সেখানে আবার স্বচ্ছ জলের মধ্যে পায়ে পায়ে হেঁটে হেঁটেই কোরাল, অক্টোপাস, কাঁকড়া আরও কত যে সব জলজ প্রাণীদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবে তার ইয়ত্তা নেই। সব মিলিয়ে গুজরাটের এই মেরিন ন্যাশনাল পার্ক’এ এক রোমাঞ্চকর পর্যটনের অদৃশ্য হাতছানি যে রয়েছে তা বলাই যায়।**সূত্রঃ উইকিপিডিয়া, জামনগর.অরজ**

একটু ভুল মন্দ নয়

একটু আধটু ভুল করা ভাল। ভুল করলে তবেই ঠিক জিনিসটা মাথায় গেঁথে যায়। এ কথা বলেছেন কানাডার টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অ্যান্ড্রি অ্যান সির। শেখার ব্যাপারে ভুলের এই গুণ না কি বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রেও ভাল কাজ করে যদিও এত দিন মনে করা হত যে তা ছোটদের জ্ঞান অর্জনেই বেশি সহায়ক হয়।

দীঘা উপকূল

দীঘা উপকূল নিয়ে নানা উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে। এই উপকূল সাইক্লোনে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। এ কথা বলা আছে ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর মার্চ ২০১৪-র এক গবেষণাপত্রে। **-পরিষেবা**

তিনটি দশক: গরম বেড়েছে প্রতিটিতে

রাষ্ট্রপুঞ্জ আবারও জানিয়েছে যে পৃথিবীর উষ্ণায়ন সম্পর্কে বিতর্কের আর কোনও অবকাশ নেই। গবেষণা থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা বলছে মানুষের কর্মকান্ডের ফলে পৃথিবী পরিমন্ডল গরম হয়ে উঠছে। এই উষ্ণায়নের হার দ্রুত কমান না গেলে আগামী দিনে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যার ফলে মানুষ সহ এই গ্রহের সব প্রাণী বিপন্ন হয়ে পড়বে।

দেখা গেছে গত তিন দশকের প্রতিটি দশক তার আগেরটি থেকে আরও বেশি গরম। বলা হচ্ছে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ১৯৮৩ থেকে ২০১২, এই ৩০ বছর, ১,৪০০ বছরের মধ্যে উষ্ণতম থেকেছে।

আবার এও দেখা গেছে যে ১৯৭১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত

সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের তাপমাত্রা প্রতি দশকে ০.১১ সেলসিয়াস হারে বেড়েছে। সেই সঙ্গে বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমান বাড়তে থাকায় গত ১৫০ বছরে সমুদ্রের জলে অ্যাসিডের পরিমানও বেড়েছে ২৬ শতাংশ।

গ্রিনল্যান্ড আর উত্তরমেরুতে বরফ গলছে খুব দ্রুত। উত্তর মেরুতে প্রায় চার শতাংশ হারে কমে যাচ্ছে সমুদ্রের বরফ। আবার উত্তর গোলার্ধে শীতের পরে দেশে দেশে তুষারের চাদর নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে আগেভাগেই। তাছাড়া সারা পৃথিবী জুড়েই সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে হিমবাহ সব ।

দেখা যাচ্ছে ১৯০১ থেকে ২০১০-এর মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ ০.১৯ মিটার উঁচু হয়ে গেছে। জমে থাকা বরফ অতিমাত্রায় গলতে থাকার ফলেই সমুদ্রের জলে এই বৃদ্ধি। এই ভাবে সমুদ্রে জল বাড়তে থাকলে অনেক উপকূল ডুবে যাবে আর সেখানে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হবে।

এ অবস্থায় কেমন হবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ? রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে বলছে এই শতাব্দীর পুরো সময় কাল জুড়েই পৃথিবীর তাপ বাড়তে থাকবে। ফলে তাপপ্রবাহ দেখা দেবে ঘন ঘন, আর সেগুলি চলবে অনেক দিন ধরে। আবার থেকে থেকেই অতিবৃষ্টি হবে অনেক জায়গায়। সমুদ্রের জল গরম হতেই থাকবে, বাড়বে তার অ্যাসিড মাত্রা, সেই সঙ্গে উঁচু হবে জলস্তর।

সব মিলিয়ে পৃথিবীর পরিবেশ আজকের তুলনায় অনেকটাই অসহনীয় হয়ে উঠবে বলেই আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা। **পিডি**

চিতাবাঘ সর্বত্র, পর্যটন বাংলোর কাছেও আসে

উত্তরাখন্ডের বিনসার এক অতি আকর্ষনীয় স্থান। আলমোড়া থেকে আরও কিছুটা ওপরে উঠলেই বিনসার অভয়ারণ্য। সেখানে ঢোকার জন্য বিশেষ অনুমতি না লাগলেও, অভয়ারণ্যের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে বন দপ্তরের চৌকিতে নাম-ঠিকানা নথিভুক্ত করতে হয়। বনের ভেতরে পর্যটন বাংলো আছে। আগে থেকে বুকিং করা থাকলে সেখানে থাকা যায়। কিছুকাল আগেও সেটিতে বিদ্যুৎ ছিল না। এখন আছে কি না তা জানা নেই। তাই শীতের রাতে রবারের 'হটওয়াটার ব্যাগ' বা গরম জলের বোতল খান তিনেক কম্বল আর লেপের আস্তরণের মধ্যে না নিয়ে শুলে, সারা রাত প্রবল শীতের কামড়ে হাত-পা অবশ হয়ে আসে।

বাংলোটির এক দিকে আকাশচুম্বি তুষার শৃঙ্গ, আর অন্য দিকে বিস্তৃত অরণ্য। সে বনে আছে অনেক কালের প্রাচীন সব ওক গাছ। তাদের মোটা মোটা কান্ড আর শক্ত শেকড় হিমালয়ের মাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকে। আছে আরও অনেক স্থানীয় পাহাড়ী

বিনসারের এক গ্রাম, চিতাবাঘের আনাগোনা এখানেও

গাছ। অভয়ারণ্য বলেই হয়ত তারা বেঁচে গেছে। কারণ, ওই সংরক্ষিত এলাকার বাইরে ওক গাছদের বিতাড়িত করে ইংরেজরা সেখানে লাগিয়েছিল পাইন। কারণ পাইন কাঠ নানা ব্যবসায়িক কাজে আসে। পাইনের বন দেখতে সুন্দর, কিন্তু হিমালয়ের পরিবেশে তার অবদান স্থানীয় গাছের তুলনায় কম। তাছাড়া গরমের সময় পাইন বনে সহজেই আগুন লেগে যায়। বিনসারের জঙ্গলে মানুষরা বসত গড়ছে। সেখানকার মুক্তাঞ্চল তাদের গবাদি পশুর চারণভূমি হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এই লেপার্ডদের শিকার মানুষও শিকার করছে। ফলে টান পড়ছে লেপার্ডদের প্রাকৃতিক খাদ্য ভান্ডারে। এখন তাই আইবেক্স, ব্লু-শিপ, মারমট ইত্যাদি তাদের প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও স্নো লেপার্ডরা গৃহপালিত ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, ইয়ক ছানা সবই শিকার করে বসছে। যার অবধারিত ফল হচ্ছে একবার স্থানীয় বাসিন্দাদের নাগালে পড়ে গেলে লেপার্ডের মৃত্যু অবধারিত হয়ে উঠছে।

ঘন বড় লোমে ঢাকা ৪/৫ ফিট এই স্নো লেপার্ড খুবই অনেক ধরনের বন্য প্রাণীর বাস। নানা প্রজাতির হিমালয়ের পাখি তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে বাঁদর আর লেপার্ড, বাংলায় যাকে বলে চিতাবাঘ।

চিতাবাঘের আনাগোনা সর্বত্র। এমনকী পর্যটন বাংলোর গেটের পাশেই তাদের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল এক ভোরে। পায়ের বড় বড় ছাপের সঙ্গে ছিল গোটা কয়েক খুদে ছাপ। অর্থাৎ মা চিতাবাঘ তার ছানাদের নিয়ে এসেছিল বাংলোর সামনে মধ্যরাতের ভ্রমণে। তারা প্রায়ই হাজির হয় গ্রামেও। ঝোপেঝাড়ে ওৎ পেতে থাকে। ছাগলটা ভেড়াটা তুলে নিয়ে যায় সুযোগ পেলেই। গ্রামবাসীরাও খুব সাবধানে বাড়ির বাইরে বেরন সন্ধের পর। কখন কোন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে চিতাবাঘ, কেউ বলতে পারে না।

তেমনই এক ঘটনার কথা শোনা গিয়েছিল এক গ্রামে। সন্ধে পেরিয়ে রাত একটু ঘন হয়েছিল তখন। পাহাড়ের গ্রামে রাত যেন একটু তাড়াতাড়িই নামে। সে রকমই এক সময়ে এক মহিলা দরজা খুলে সিঁড়িতে পা রাখতেই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘ। যেন দরজার পাশেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল সে। মহিলার চিৎকারে অন্যরা হৈ হৈ করে ছুটে এলে উনি প্রাণে বেঁচে যান। অনেক সময় শীতের দুপুরে গ্রামের নীচে পাথরের প্রশস্ত চাতালে চিতাবাঘকে গা এলিয়ে রোদ পোহাতেও দেখা যায়।

এই বিনসার অভয়ারণ্যকে ঘিরে এখন কিছুদিন গোলমাল চলছে। বন দপ্তর ওই সংরক্ষিত বোনের সীমা বাড়াতে চাইছে। কিন্তু গ্রামবাসিরা তার ঘোর বিরোধী। তাঁরা বলছেন অভয়ারণ্যের আয়তন বাড়লে তাঁরা বনের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবেন। জঙ্গলের ওপর তাঁরা নানাভাবে নির্ভর করেন। বনের ফলমূল, শুকন ডালপালা, বনৌষোধি সবই তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। আর ওই বনের সম্পদের অধিকার নিয়েই বাড়ছে বরোধ।

পি.ডি.

পাহাড়ের রাজা তুষার চিতার রাজ্যে বিপদ

পাহাড়ের রাজা বলা হয় তাকে। সমস্ত মধ্য এশিয়ার ভয়ঙ্কর ঠান্ডা আর রুক্ষ পাহাড়ি বিস্তৃত অঞ্চলকে সে যেন শাসন করে। কিন্তু অসাধারণ দেখতে ধূসর রঙের বিরল এই তুষার চিতাবাঘ বা স্নো লেপার্ডরাও আজ বিপন্ন। কারণ তার বাসস্থান ওই অত্যন্ত দুর্গম কঠীন প্রাকৃতিক পরিবেশেও হত্যাকারীরা পৌঁছে যাচ্ছে। এবং রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, কাজাখস্থান ভারত, ভূটান, নেপাল সহ মধ্য এশিয়ার ১২ দেশে এই লেপার্ডদের দেখা যায় বটে কিন্তু তাদের সংখ্যা কমেই চলেছে।

এক তো স্নো লেপার্ডদের আবাসস্থলে গিয়ে স্থানীয়

তুষার চিতার দুর্গম বাসস্থানেও হত্যাকারীরা পৌঁছে যাচ্ছে

বিপন্ন যারা

শক্তিশালী, লাফাতেও পারে খুব প্রায় ৫০ ফিট পর্যন্ত। তার দেহের তিনগুণ বেশি ওজনের প্রাণীকে সে অনায়াসেই শিকার করে। লাজুক প্রকৃতির এই প্রাণী সাধারণত খাড়া পাহাড়ে থাকতে ভালবাসে। তাদের সংখ্যা সাড়ে তিন থেকে সাত হাজারের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এর বাইরে চিড়িয়াখানায় ৬০০ - ৭০০ স্নো লেপার্ড আছে। জানুয়ারি থেকে মার্চের মাঝামাঝি তাদের প্রজনন সময়। ২/৩ এর বেশি বাচ্চা দেয় না। বাঁচে সাধারণত ২০/২৫ বছর। সাধারণত ভোর ও সন্ধে বেলা তারা সক্রিয় থাকে। তবে অন্য লেপার্ডদের মত তারা গর্জন করতে পারে না বলে তাদের দেখা পাওয়া বিরল।

সূত্রঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ.অরজ

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: December 1, 2014 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে মাছেদের নাকি কোনও ব্যথা যন্ত্রণার বোধ নেই। কারণ তাদের মস্তিষ্কে সেই ব্যবস্থা নেই যার মাধ্যমে তার কোনও কষ্টের অনুভব হয়।

● আমরা জানি পৃথিবী সূর্যের চারপাশে অবিরত ঘুরে চলেছে, কিন্তু তার গতিবেগ কত? ঘন্টায় প্রায় ১০০০ মাইল।

● অস্ট্রেলিয়ার মলি ফাউল পাখি যে বাসা তৈরি করে তার উচ্চতা সাড়ে ১৬ ফিট এবং চওড়া হয় প্রায় ৩৬ ফিট।

● বাঘেরা ভাল সাঁতারু। এক টানা তারা ৬.৫ কিমি সাঁতার কাটতে পারে।

● গোরিলা মানুষের খুবই কাছাকাছি প্রাণী। তাদের মধ্যে অনেক মিল যেমন শ্রবন, দর্শন, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ - এই সমস্তের অনুভূতি তাদের মানুষের মতোই।

● মশারা কিন্তু অন্য রঙের থেকে নীল রঙের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়।

ঘোড়ার পূর্বপুরুষ ছিল ভারতে, পাঁচ কোটি বছর আগে

ঘোড়া ছাড়া মানুষের চলে না। অন্তত, বলা যায় চলত না এক সময়। মানুষের সভ্যতায় ঘোড়ার অবদান অসীম। ওদের সাহায্য না পেলে মানুষের সভ্যতা হয়ত আজ বহু যুগ পেছনে পড়ে থাকত। কিন্তু প্রশ্ন ঘোড়ারা এল কোথা থেকে?

মনে করা হচ্ছে ঘোড়া আর গন্ডারের উৎপত্তি ভারতেই। এমন ধারণা হওয়ার কারণ হল এই কিছুদিন আগে গুজরাটের এক খোলা কয়লা খনিতে পাওয়া গেছে কিছু প্রাচীন প্রাণীর হাড় যা দেখে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে সেগুলি এমন এক প্রাণীর অবশেষ যাদের থেকেই এক সময় আসে ঘোড়া আর গন্ডার।

ঘোড়া আর গন্ডারের পূর্বপুরুষদের বলা হয় পেরিসোড্যাক্টিলা **(শিল্পীর কল্পনায় আঁকা ছবি)**। কিন্তু তাদেরও তো আদিপুরুষ ছিল। তারা কোথায় ছিল? গুজরাটের কয়লা খনি থেকে পাওয়া গেছে যে প্রাণীর নানা ধরণের হাড়ের জীবাশ্ম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা বলছেন সেই প্রাণীরাই ছিল আজকের ঘোড়ার সুদূরতম পূর্বপুরুষ। তাদের নাম ক্যাম্বেথেরিয়াম থেউইসি। তারা ছিল আজ থেকে ৫.৪৫ কোটি বছর আগে।

সূত্রঃ ওয়ার্ল্ড সায়েন্স

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট–হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

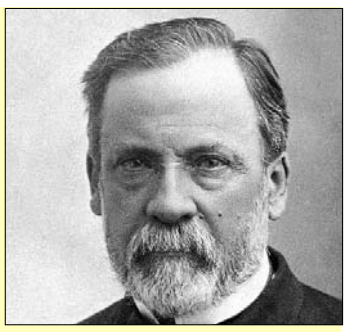

১। লুই পাস্তুর কিসের প্রতিশেধক টিকা আবিস্কার করেছিলেন?
(ক) টাইফয়েড (খ) জলাতঙ্ক
(গ) হাম (ঘ) কলেরা

২। কোন শহরের কিছু অংশ ইউরোপে আর বাকি অংশ এশিয়াতে?
(ক) ইস্তাম্বুল (খ) বেইরুট (গ) মস্কো (ঘ) জেরুসালেম

৩। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলকে অনেক সময় বলা হয় প্রোটিয়াগুলি। প্রোটিয়া কি?
(ক) দ্রুতগতি হরিণ (খ) পৌরাণিক অতি শুক্তশালী দৈত্য (গ) মূল্যবান হিরে (ঘ) একরকম ফুল

৪। কোন কোন ক্রিড়াবিদকে অর্জুন পুরষ্কার দেওয়া হবে তার নির্বাচন কমিটির প্রধান এখন কে?
(ক) পি টি উষা (খ) বাইচুঙ ভুটিয়া (গ) কপিল দেব (ঘ) রামনাথন কৃষ্ণন

৫। নীচের পরিবর্তিত নামগুলি কালানুক্রমে সাজাতে হবে অর্থাৎ কোনটি আগে কোনটি পরে।
(ক) বোম্বে-মুম্বাই (খ) ম্যাড্রাস-চেন্নাই (গ) ক্যালকাটা-কলকাতা (ঘ) বেঙ্গালোর -বেঙ্গালুরু

৬। মানুষ আর শিম্পাঞ্জির কত শতাংশ ডি এন এ এক?
(ক) ৯৮.৮ (খ) ৭.৫ (গ) ৭৪.৯৮ (ঘ) ৫০.২৫

৭। অন্ধ্রপ্রদেশের ভেঙ্কটগিরি, ছত্তিশগড়ের চান্দেরি, তামিল নাড়ুর তাঞ্জাভুর আর পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর - এরা কি একটি কারণে বিখ্যাত?
(ক) পুরনো মন্দির (খ) দুর্গা (গ) ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহের যুদ্ধক্ষেত্র (ঘ) রেশম বা সিল্ক উৎপাদন

৮। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্যার আলেকজান্ডার কানিঙহাম ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্যদের সাহায্যে কি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করেছিলেন?
(ক) হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো (খ) সাঁচি স্তূপ (গ) বুদ্ধগয়ার মহাবোধির মন্দির (ঘ) তাম্রলিপ্ত'র ভাঁড়ার

৯। পশ্চিমবঙ্গে এখন নবান্ন কিন্তু ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে সরকারি সদর দপ্তরের এখন কি নাম?
(ক) সেক্রেটারিয়েট (খ) মন্ত্রালয় (গ) সচিবালয় (ঘ) কর্মশালা

১০। কলার বৈজ্ঞানিক নাম মুসা সেপিয়েন্টাম, এর মানে কি?
(ক) রাজার ফল (খ) জ্ঞানী লোকের ফল (গ) হলুদ ফল (ঘ) সাপের মতন ফল

উত্তর: ১/খ; ২/ক; ৩/ঘ; ৪/গ; ৫/(ক) ১৯৯৫ (খ) ১৯৯৬ (গ) ২০০১ (ঘ) ২০০৭; ৬/ক; ৭/ঘ; ৮/গ; ৯/ক; ১০/খ; মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হোমো স্যাপিয়েন।

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি মালবী গুপ্তর পক্ষে অনীশ গুপ্ত দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com